আলিবাবা, আবদাল্লা, সিন্দবাদ ঃ বাঙালি পাঠক

অণকুমার মুখোপাধ্যায়

সারা দুনিয়ার লোক পড়েছে আরব্য উপন্যাস। ফরাসি অনুবাদ থেকে ইংরেজি অনুবাদ মারফৎ আরব্য উপন্যাসের কাহিনী ছড়িয়েছে সারা দুনিয়ায়। রিচার্ড বার্টনের ইংরেজি অনুবাদ বাঙালিকে আরব্য উপন্যাসের জগতে প্রবেশের পথ দেখিয়েছে। 'এক সহস্র এক রজনী' নামেও পরিচিত 'অ্যারেবিয়ান নাইটস'। মধ্যযুগে আরবি ভাষায় সংকলিত হয় এই কাহিনীমালা। এর সূচনা অনেক পূর্বেকার। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ২৬৪টি গল্পের বেশ কিছু সংখ্যক গল্প আরব দুনিয়ার মদেশে ছড়িয়ে ছিল। স্বভাবতই তখন তা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সে সময়কার মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সমাজে এগুলি লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। শোনা যায়, তখন কিছু গল্প মধ্যযুগে ইউরোপে পৌঁছয়। খ্রিস্টীয় দশম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে আরব্য জগতে এইসব গল্পের সংগ্রহ বাড়তে থাকে, যেগুলি ধীরে ধীরে গল্পমালায় গ্রথিত হয়। গল্পের তার মধ্যে গল্প--এভাবেই গল্পমালা গাঁথা হয়ে যায়। প্রাচ্য জগতের রহস্যরোমাঞ্চে ভরা পরিবেশে গাঁথা এইসব গল্পচত্র সংহত হয়। আনুমানিক ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরব্যরজনীর কাহিনী বর্তমান রূপ পায়।

আরব্যরজনী-গল্পমালার কাঠামোটি চিত্তাকর্ষী এবং বহুকাল ধরে প্রচলিত। গল্পের মধ্যে গল্প, তার মধ্যে আরো গল্প--এই কাঠামো তৈরি হয় নিপুন বিন্যাসে। প্রাচীন ক্লাসিকাল সাহিত্যে অনেকদিন যাবৎ তা চলে আসছে। ওভিদ, মেটামরফসিস, চসার-এর ক্যান্টরবেরি টেলস, বোকাচ্চিও, ডেকামেরন-পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এইসব গল্পমালা প্রচলিত।প্রাচ্য জগৎ দুনিয়াকে উপহার দিল আরব্যরজনী-গল্পমালা। ফরাসি ও ইংরেজি অনুবাদ মারফৎ তা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যায়।
প্রথম পাশ্চাত্য অনুবাদ করেন আঁতোয়ান গলাঁদ। ১৭০৪-১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধে ্যফরাসিতে আরব্যরজনী গল্পমালা অনূদিত হয়। ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনূতিত হয়। এবং তার প্রভাব পড়ে ইয়োরোপের নানা গল্পমালায়। বাঙালির কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে আলিবাবার ও চল্লিশ দস্যুর গল্প, আলাদিন ও তার আশর্চ্য প্রদীপের গল্প আর সিন্দবাদ নাবিকের নানা রোমাঞ্চক গল্প।

আরব্যজনীয় গল্পমালা পুরোপুরি অনূদিত হয়নি ইয়ুরোপে। অনেক জায়গায় তার সংক্ষেপিত রূপান্তর গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনুবাদ (উদাহরণ রিচার্ড বাট নের অনুবাদ) প্রাচ্য ও মুসলিম দুনিয়ার রোমাঞ্চকর পরিবেশ, আচার সংস্কার প্রথা, এবং ইন্দ্রিয়উপভোগের বিচিত্র রূপ গৃহীত হয়েছে। এইসব গল্পের পিছনে কোনো নৈতিক উপদেশ সত্রিয় ছিল না (যেমন ছিল পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশের গল্পে বা জাতকের গল্পে) এক বিচিত্র উত্তেজক গল্পলোক। তবে তা একেবারে নৈতিক সার বর্জিত ছিল না।

আরব্যরজনীর অসীম জনপ্রিয়তার মূলে আছে আশর্চ্য গল্প পরিবেশ, বাস্তব আর উদ্ভট কল্পলোকের সমাবেশ। সব গল্পই এসেছে মলোকের পটভূমিতে। সেইসঙ্গে এসেছে আকাশ পাতালের নানা রহস্যময় পটভূমি। মভূমিতে চলেছে উটের 'কাফেলা', ঘোড়ার ও গাধার চড়া ডাকাত-দল, আকাশতলে খোদাতালার উদ্দেশে উচচারিত প্রার্থনা, আরবদেশের শহর

গত্তেরে কৌতূহলী জনতা-সবটা মিলিয়ে এত বিচিত্র পটভূমি এই গল্পধারাকে সজীব করে রেখেছে।

আর পদে পদে উত্তেজনাভরা অ্যাডভেঞ্চার--জলে স্থলে আকাশে লৌকিক আর অতিলৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ নানা বিচিত্র কাহিনী, বিচিত্রতর ধনরাশি ও উপভোগ্য পোষাক ও খাদ্যের বিবরণ, অভিজাত ও রোমান্টিক রহস্যভরা জীবনযাত্রা, বিদ্রূপ ও কুৎসিতের, সুন্দর ও ভয়ংকরের সমাবেশে উজ্জীবিত মানুষ দৈত্য পরীদের বিচিত্রতর কাহিনী। সবটা মিলিয়ে এক উত্তেজক রোমাঞ্চক অ্যাডভেঞ্চার। প্রাচ্যজগতের অতুল সম্পদ্ ধনরাশি, রহস্যময় মানুষ ও দৈত্য-পরী-জিন্দের দল পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। সেইসঙ্গে আছে বিচিত্র সব জাদুকর ও তাদের বিচিত্র জাদুবিদ্যার প্রকাশ, অলৌকিক গাছ ঝর্না, গুহা, বিচিত্র সুগন্ধি, বিচিত্র ফুল, রাজকুমার দল, দৈত্য ও জিনদের নানা আশর্চ্য কীর্তি। সবটা মিলিয়ে শ্রোতা ও পাঠকের মনে রেখে যায় এক গভীর ছাপ। তাই এক সহস্র এক রজনীর কাহিনী বারবার শুনেও আবার শুনতে ইচছা করে।

যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় আরব্য কাহিনীমালা লেখেন 'প্রবাসী'মাসিকপত্র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রচছদে লেখা আছে 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।' সোজাসুজি তিনিই লেখক তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

এটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ থেকে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ১৯১৭ সালে। তৃতীয়সংস্করণ ১৯২৪ সালে। চতুর্থ সংস্করণ ১৯৩০ সালে। বহু বছর এই বইটি শিশু -কিশোর ও বয়স্ক বাঙালি পাঠকের মনোরঞ্জন করেছিল। ১৯৩০ সালের সংস্করণের পর বহুকাল বইটি পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক বছর পরে দে'জ পাবলিশিং থেকে পূনর্মূদ্রিত হয় জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে (মাঘ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)। এবং ছয় বছর পরে দে'জ থেকেই তা আবার পুণর্মুদ্রিত হয় ১৯৯৯ সালে (জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বঙ্গাব্দে)।

রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় - সম্পাদিত এই বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছিলেন----
'আপনার সম্পাদিত বাংলা আরব্য উপন্যাস উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি পূর্বেই ইহা ত্রয় করিয়া আমার পরিবারস্থ বালক বালিকা ও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবকাশ কালে পড়িবার জন্য দিয়াছি--ইহা হইতেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন। জগতে কথা-গ্রন্থের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের তুলনা পাওয়া যায় না--অথচ নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গৃহস্থ ঘরে রাখা যায় না আপনি সংশোধিত আকারে বাংলায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়ো শিশুপাঠ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ শিশু সম্প্রদায়ের পিতামাতারও মনোরঞ্জন করিবার যোগ্য।' ('চিঠিপত্র' ১২, বিশ্বভারতী ১৯৮৬, পৃ. ২২৫)

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যে অনুধাবন করা যায়, সোজাসুজি আরব্যরজনী কাহিনীমালা শিশু-কিশোরদের পাতা দেওয়া যায় না। তা সম্পাদিত রূপেই দেওয়া যায়। অর্থ্যৎ মূল কাহিনীমালায় যে বীভৎস ভয়ংকর লাস্যময় যৌবন-উন্মাদনাময় অংশগুলি আছে, সেগুলি কিশোরচিত্তের পক্ষে উপকারী নয়।

রামানন্দ-সম্পাদিত আরব্য উপন্যাসের বিষয়সূচীতে চল্লিশটি কাহিনী আছে. প্রথমটি উপক্রমণিকা -- পারস্যের সুলতান শাহরিয়ার এবং তার অমাত্যকন্যা (এক জাতের বেগম) শাহারজাদীর কাহিনী। প্রতি রজনীতে একটি যুবতীকেবিবাহ ও রজনীশেষে তার প্রাণবধ--এই সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সুলতান শাহরিয়ার, তার কারণ তার প্রথম বেগমের নষ্টামি। তাকে বউ করার পর শাহরিয়ার শোকে উন্মাদ ও নারীজাতি সম্পর্কে প্রবল ঘৃণায় বিড়ম্বিত। তখনি শু হল নিষ্ঠুর খেলা--প্রতি রজনীতে একটি সুন্দরী তণীকে বিবাহ ও রজনীশেষে তাকে হত্যা। এমন নিষ্ঠুরলীলা চলতেই থাকল, তা থাকল যখন অমাত্য-কন্যা শাহারজাদী স্বেচ্ছায় সুলতানকে বিবাহ করেন। সেই রজনীতেই তাঁর অনুরোধে সুলতানের শেষরাতে তার বোন দিনারজাদীকে আনিয়ে নেওয়া ও বোনের অনুরোধে তাকে একটি গল্প বলা। রজনীশেষে গল্প শেষ না হওয়ায় সুলত

ান বেগমের নিধন একদিন পিছিয়ে দিলেন। এভাবেই রাতের পর রাত শাহারজাদীর গল্পকথন ও রাতশেষে গল্পের টানে মুগ্ধ উৎসুক সুলতানের বেগম-নিধন স্থগিত রাখা। এভাবেই এক হাজার এক রজনী অতিব্যহিত হওয়ার পর গল্পমুগ্ধ সুলতান বেগম-নিধান-আজ্ঞা রদ করলেন। তারপর বেগম শাহারজাদীকে নিয়ে সংসার যাপন শু করলেন।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যয়ায়ের ভাষায় গল্পমালার সূচনাটি এইরূপ ঃ

উপত্রমণিকা
শাহরিয়ার ও তাঁহার রাণী
সেকালে পারস্যদেশে শাহরিয়ার নামে এক সুলতান ছিলেন। তিনি তাঁহার এক রাণীকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসব পরে তিনি ঐ রাণীকে অত্যন্ত দুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পারস্যদেশের তখনকার নিয়ম অনুসারে তঁাহাকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার হুকুম পালন করিলেন। রাণীর প্রাণ গেল। এ দিকে রাজা শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, সব মেয়েই তাঁহার রাণীর মত দুষ্ট; সুতরাং জাগতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত কমে, ততই ভাল। এইজন্য তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক-একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে লাগিলেন এবং পরদিন সকালে প্রধান মন্ত্রীর সম্মুখে তাহাদের ফাঁসী হইতে লাগিল। প্রতিদিন এক- একটি স্ত্রী জুটাইবার ভার প্রধান মন্ত্রীর উপর ছিল। তিনি বড়ই অনিচ্ছার সহিত এই কাজ করিতেন; কিন্তু সুলতানের হুকুম আগ্রাহ্য করিতে তাঁহার সাহস হইত না। সুতরাং প্রতিদিন একটি মেয়ের বিবাহ হইত এবং একটির প্রাণযাইত।
এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার কথা ত্রমে ত্রমে সব জায়গায় ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্য-মধ্যে সুলতানের অত্যন্ত নিন্দা উঠিল এবং প্রজারা ভয় পাইয়া নিজেদের মেয়েদের লইয়া মহা বিপদে পড়িল। চারিদিকে হায় হায় শব্দ;--কোন স্থানে বাবা মেয়ের শোকে ব্যাকুল হইয়া দিনরাত কাঁদিতেছেন; কোথাও বা মা অভাগিনী মেয়েদের কপালে কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়া ভয়ে অস্থির হইতেছেন। কেহ কেহ বা পারস্যদেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

যে রাজমন্ত্রী সুলতানের হুকুমে এই ভয়ানক অত্যাচারে প্রভুর সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহার দুই মেয়ে ছিল ; বড়টির নাম শাহারজাদী, ছোটটির নাম দিনারজাদী। ছোট মেয়েটি খুব গুণবতী ছিলেন; কিন্তু বড়টির বুদ্ধি বিবেচনা আরসাহস এমন ছিল য, মেয়েদের মধ্যে তেমন প্রায় দেখা যায় না। ঐ মেয়েটি খুব লেখা - পড়া শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার এমন মনে রাখিবার ক্ষমতা ছিল যে, যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিয়ে যাইতেন না। তা ছাড়া এই ময়েটি খুব সুন্দরী আর ভাল ছিলেন ; তাই মন্ত্রী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। একদিন সকলে একসঙ্গে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাহারজাদী তাঁহার বাবাকে বলিলেন, ‘‘বাবা! আপনার কাছে আমি একটা জিনিষ চাইব, যদি দেন, তা’হলে খুব খুশী হব।’’ মন্ত্রী কহিলেন, কি চাও বল; দেবার মত হলে নিশ্চয়ই দেব।’’ শাহারজাদী বলিলেন ‘‘শুনেছি আমাদের রাজা প্রতিদিন এক-একটি মেয়েকে মেরে ফেলেন।তাতে তাদের মায়েরা বড়ই কষ্ট পান। আমি তাঁদের দুঃখ দূর করবার জন্যে এক উপায় ঠিক করেছি।’’ মন্ত্রী বলিলেন, ‘‘তোমার এই ইচ্ছা ভাল বটে, কিন্তু তুমি কি উপায়ে ঐ উৎপাত দূর করবে?’’ শাহারজাদী বলিলেন, ‘‘সুলতানের কনে ত আপনিই রোজ ঠিক করেন। একদিন আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিন, এই আমার ইচ্ছা।’’
মন্ত্রী এই কথা শুনিবামাত্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘‘বাছা! তুমি কি পাগল হয়েছ, যে ইচ্ছা করে এমন কাজ করতে চাও ? তুমি কি জান না, যে, রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, রাত্রে যাকে বিয়ে করবেন, রাত্রি শেষ হলে তাকে মেরে ফেলবেন? তবে তুমি কি সাহসে তাঁর রাণী হতে চাও ? সাবধান, আর কখনও এমন কথা মুখে এনো না।’’ মন্ত্রীর মেয়ে বলিলেন ‘‘বাবা! এতে যে বিপদ হতে পারে, তা আমি বেশ জানি। পরের উপকার করতে গিয়ে প্রাণ গেলে কিছুমাত্র নিন্দা হবে না, কিন্তু যদি কোনও রকমে আমি এই মেয়ে-খুন-করা বন্ধ করতে পারি তা’হলে চিরকাল আমার সুনাম থাকবে’’। মন্ত্রী বলিলেন, ‘‘তুমি নিজের জেদ বজায় রাখ্বার জন্য যা খুসি বল, কিন্তু তুমি মোটেই মনে কোরো না যে, তোমার কথায় ভুলে আমি নিজে তোমাকে যমের হাতে সঁপে দেবে। যখন সকালে রাজা আমাকে রাণীর মাথা কাট্তে হুকুম দেবেন, বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর হুকুম পালন করতে হবে। কাজেই বাবা হয়ে নিজের হাতে মেয়েকে মারবার

সময় আমার মনের কি অবস্থা হবে, বাছা, তা একবার ভেবে দেখ।" শাহারজাদী বলিলেন, "দোহাই বাবা! আপনাকে হাত জোড় করে বল্‌ছি, আমাকে এ বিষয়ে নিরাশ করবেননা।" মন্ত্রী বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কেন বার বার জেদ করছ?"

মন্ত্রী যখন দেখিলেন মেয়ে কিছুতেই ছাড়িল না, তখন তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আজ রাত্রে আমার বড় মেয়ে শাহারজাদী আপনার রাণী হবেন।"রাজা অবাক্ হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেলন, "তুমি সত্য-সত্যই আমার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মেয়ের একদিন রাণী হবার বড় সাধ; এতে প্রাণ যায়, তাও স্বীকার।" রাজা বলিলেন, "তাতে আর আশর্চ্য্য কি ? কিন্তু কাল যখন আমি তোমাকে তার মাথা কেটে ফেল্‌তে হুকুম কর্‌ব তখন তোমাকে আমার কথা শুন্‌তেই হবে।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, নিজের হাতে মেয়েকে মেরে ফেলা বাবার পক্ষে যদিও একেবারেই অনুচিত, তবুও প্রভুর হুকুম অগ্রাহ্য কর্‌বার নয়; কাজেই তা আমকে নিশ্চয়ই পালন কর্‌তে হবে।" ইহা বলিয়া মন্ত্রী বাড়ী গিয়া মেয়েকে ঐ সমস্ত কথা জানাইলে তিনি খুব খুসী হইয়া বারাকে প্রণাম করিলেন। মেয়ের প্রাণ যাইবার ভয়ে মন্ত্রী বড়ই দুঃখিত হইয়া রহিলেন।

শাহারজাদী রাাজার সহিত দেখা করিবার মত পোষাক পরিয়া ও সাজগোজ করিয়া, আপনার ছোট ভগিনী দিনারজাদীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "স্নেহের ভগিনী! একটি কঠিন কাজে তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে, আমি অনুরোধ করছি তাতে কখনও অরাজী হয়ো না। তুমি শুনে থাকবে, আজ রাত্রে জারার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি মহারাজের অনুমতি নিয়ে তোমাকে শোবার ঘরেই রাখ্‌ব। তুমি ভোর হবার একঘন্টা আগে বিছানা থেকে উঠে আমাকে বলবে. 'দিদি! যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, তা হলে তুমি অন্য দিনের মত আমাকে একটি সুন্দর গল্প বল।' তখন আমি একটি খুব সুন্দর গল্প আরম্ভ করব; আর আশা করি সেই জোরে এই রাজ্যে রোজ যে ভয়ানক অন্যায় কাজ হচ্ছে, তা বন্ধ করতে পারব।" দিনারজাদী বোনের এই চমৎকার উপায়ের অনেক প্রশংসা করিয়া নিজে সেই অনুসারে চলিতে তখনই স্বীকার করিলেন।

মন্ত্রী সন্ধ্যার সময় রাজার হাতে পরম আদরের মেয়েকে সঁপিয়া দিয়া দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাজা শুইবার ঘরে ঢুকিয়া মন্ত্রীর মেয়েকে ঘোমটা খুলিতে বলিলেন। তিনি ঘোমটা খুলিলে রাজা তাঁহার আশর্চ্য রূপ দেখিয়া অবাক ইহলেন, এবং তাঁহার চোখে জল দেখিয়া তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ ডিজ্ঞাসা কলিলেন। নূতন রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটি ছোট বোন আছে. আমি তাকে বড়ই ভালোবাসি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, এইজন্যই আমি কাঁদ্‌ছি। যদি মহারাজ আজ রাত্রে তাকে এই ঘরে শুয়ে থাকবার অনুমতি দেন, তা হলে আমি মরবার আগে আর-একবার বোনের মুখ দেখে পরম সুখে মর্‌তে পারি।" রাজা মন্ত্রীর মেয়ের এই কথায় রাজী হইয়া তখনই দিনারজাদীকে সেইখানে আনাইলেন। তারপর শাহারজাদী রাজার সহিত অনেক হীরকমুক্তামাণিক - বসান এক উচচ পালঙ্কে শুইয়া রহিলেন। দিনারজাদী তাহার পাশে নীচে আর-এক বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ভোর হইবার এক ঘন্টা আগে দিনারজাদী উঠিয়া বলিলেন, "দিদি, যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, তা হলে একটু কষ্ট করে আমাকে আগের মত একটি অদ্ভুত গল্প বলে জন্মের মত সুখী কর।" শাহারজাদী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি বলেন?" রাজা কহিলেন, "আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প বল।" শাহারজাদী রাজার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্প আরম্ভ কলিলেন।"

দ্বিতীয় য়ে আরব্য কাহিনীমালা বাংলাভাষায় পাওয়া যায় সেটি লিখেছেন (সম্পাদনা করেছেন) তারাপদ রাহা। রূপা অ্যান্ড কোম্পানি থেকে তা বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তারপরে সেসব ছোট ছোট খণ্ড একত্রর করে মোট ছয় পর্বে তা প্রকাশিত হয় 'রূপা' থেকেই। এই সাত পর্ব-ই রূপা-প্রকাশিত তারাপদ রাহা সম্পাদিত 'আরব্য রজনী' (রামানন্দের বইটির নাম 'আরব্য উপন্যাস')। রূপা-প্রকাশিত সাত পর্ব প্রকাশিত হয় যথাক্রমে--১ম পর্ব, শ্রাবণ ১৩৮৭ (আগষ্ট ১৯৮০),২য় পর্ব,

অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ (নভেম্বর ১৯৭৯); ৩য় পর্ব, বৈশাখ ১৩৭৭ (এপ্রিল ১৯৭০); ৪র্থ পর্ব--এই পর্বটি আমি দেখতে পাইনি, ৫ম পর্ব, আষাঢ়১৩৯০ (জুলাই ১৯৮৩); ৬ষ্ঠপর্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ (জুম ১৯৮৭); ৭ম পর্বটি আমি দেখি নি।
লক্ষ্য করে দেখা যাবে, পর্বের ক্রমানুসারে প্রকাশ তারিখ বিন্যাস্ত হয়নি। মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড একত্র করার সময় পরস্পরা ঠিক রাখা হয়নি। দুঃখের বিষয়, সাত পর্বে সাতটি গ্রন্থে প্রকাশিত, তারাপদ রাহা-সম্পাদিত 'আরব্য রজনী' এখন আর লভ্য নয়।
আরব্য উপন্যাস বা আরব্য রজনী বা এক সহস্য এক রজনীর গল্পমালা-- যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, শিশু-কিশোর-বয়স্ক চিত্তহারী একাধিক সংস্করন এখানে বাংলাভাষায় লভ্য নয়। অথচ গল্পপিপাসুদের কাছে এই কাহিনীমালার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।
প্রকাশক রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতি পর্বের সূচনার প্রথম পৃষ্ঠায় বইটি সম্পর্কে একটি বক্তব্য মুদ্রিত হয়েছে ঃ
"আরবে বাদশাহী মহল থেকে ধূসর মপ্রান্তর পর্যন্ত একদিন যে গল্পের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার স্পর্শ আজও বিশ্বের রসিকচিত্তে অম্লান হয়ে আছে।"
শাহারজাদী বাদশার মুখোমুখি বসে শু করেছেন তার গল্প। প্রাসাদ থেকে দেখা যাচ্ছে রহস্যময়ী রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশ। কিন্তু এই রাত্রির অবসানেই যে নেমে আসবে শাহারজাদীর উপর চির-রাত্রির অন্ধকার, দিনের প্রথম আলোকে শাহারজাদীকে বরণ করতে হবে মৃত্যু--এই হল বাদশাহী ফরমান।
ভোর হয়, তবু শেষ হয় না গল্প। বাদশাহের গল্পপিপাসু মন বলে ওঠে, অরও--আরও--আরও। তাই সেদিনের মতো রদ হয়ে যায় মৃত্যুর ফরমান।
এমনি করে গল্পের যাদুকরী শাহারজাদী সৃষ্টি করে চলেন প্রতি রজনীতে এক একটি করে গল্পের যাদুমহল। সে মহলের প্রতি কক্ষে অপেক্ষা করে থাকে অপার বিস্ময় আর রোমাঞ্চের শিহরণ। তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেন তাঁর শ্রোতাকে গল্পের সেই রহস্যপুরীর মধ্য দিয়ে।
তারপর যেদিন শেষ হল গল্প সেদিন কি নেমে এসেছিল শাহরাজদীর উপর মৃত্যুর খাঁড়া, না অপেক্ষা করেছিল কোনো অভাবনীয় পুরস্কার।"
আরব্যরজনী গ্রন্থের প্রতি পর্বের সূচনায় এই সুলিখিত প্রস্তাবনাটি মুদ্রিত আছে। পরে এই---'আদিকথা', যা লিখেছেন বইটির লেখক তারাপদ রাহা। তা এখানে উদ্ধার করি।--

আদিকথা
প্রতারণা আর বেইমানি কেউই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেটা আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। যাকে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা গিয়েছিল তার দ্বারা যদি মানুষ প্রতারিত হয়, তা একেবারে। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে মানুষের মন।

ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল একদিন ইরানের বাদশা-মহলে, অনেক - অনেক কাল আগে। বাদশা শাহরিয়ার তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বেইমানিতে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁকে হত্যা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল সমস্ত নাজীজাতির উপর হারেমের অন্যান্য বেগমের গর্দান নিয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, উজিরকে ডেকে তিনি বললেন-- শোনো উজির, রোজ সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনবে ; ঝাঁকজমকে বিয়ে করব তাকে। একটি রাত্রি শুধু বেগমের মর্যাদা পাবে সে আমার কাছে থেকে, পরদিন ভোরেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে, এ ভারও রইল তোমার ওপর।

শুনে তো উজিরের বুক থর থর করে কাঁপতে লাগল, একি বিষম ফরমান বাদশার!---কিন্তু উপায় কি, বাদশার হুকুমতো তাঁকে তালিম করতেই হবে; নইলে তাঁর নিজেরই গর্দান যাবে!
তারপর আমীর ওমরাহদের কোনো না কোনো এক বাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল ওঠে, বাদশার হুকুমে উজিরকে

কোনো না কোনো বাড়ি থেকে বাপ-মায়ের কোল শূন্য করে তাদের নয়নের মণি সদ্যফোটা গোলাপের মতো তণী মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে হয়, আর ভোর হবার সঙ্গে তাকে তুলে দিতে হয়, জল্লাদের হাতে।

এমনি করে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বছর ঘুরে এলো। শেষে এমন দিন এসে গেল যখন উজির দেখলেন, নিজের দুই মেয়ে ছাড়া বাদশার যোগ্য আর কোনো মেয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিন বিষণ্ণমুখে উজির সেই কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর বড়ো মেয়ে শাহরাজাদী কাছে এগিয়ে এলো। মেয়েটি যেন হীরের টুকরো, যেমনি রূপ তেমনি বিদ্যা আর তেমনি বুদ্ধি। এই বয়সেই যত রকমের কেতাব আছে সবই সে পড়ে ফেলেছে। তাছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গী এতই মধুর যে, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে বাপের পাশে বসে বললে--কি ভাবছ আববা, এমনি মুখ ভার করে?

ভাবছি--আজ সন্ধ্যায় বাদশার জন্য বিয়ের কনে জোটাব কোত্থেকে ? দেশে তো আর বিয়ের বয়সী মেয়ে নেই রে, মা!

মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে-- কেন আববা, আমার বিয়ের বয়স কি হয়নি?

শুনে চমকে উঠলেন উজিরঃ কি বলছিস তুই! বাপ হয়ে জেনেশুনে তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো!? যাদের এতদিন দিলে আববা, তাদেরও তো বাপ-মা ছিলো।

সে বাদশার আদেশ পালন করেছি।

মেয়ে যখন আর দেশে নেই, তখন আমাকে পাঠানোই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি না নিয়ে যাও, তাহলে আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব বাদশার কাছে।

শুনে তো উজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে শাহরাজদীর মায়া হল স্নিগ্ধ হাসি হেসে সে বলল--আববা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এক ফন্দি এঁটেছি, যদি সেটা ঠিক মতো খাটাতে পারি, তাহলে আমি তো বাঁচবই-- তার সঙ্গে রক্ষা পাবে দেশের কুমারী মেয়েদের জান আর মান।

মেয়ের কথায় পুরো স্বান্ত্বনা পেলেন না উজির।ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি বাদশার দরবারে চলে গেলেন।

এগিয়ে এলো শাহরাজীদীর ছোট বোন দুনিয়াজাদী তার দিদির কাছে। জিজ্ঞাসা করল--আববার সঙ্গে কি এত কথা হচ্ছিল রে দিদি, তোর ?

দিদি হেসে বলল---আমি আজ বাদশার বেগম হতে যাচ্ছি রে, বোন।

তুই ?--বলতে গিয়েই দুনিয়ার দু'চোখ জলে ভরে এলো।

ছিঃ, কাঁদিসনে, বোকা মেয়ে। শোন, এক ফন্দি এঁটেছি আমি। বেগম হয়ে শেষরাত্রে বাদশার কাছে বায়না ধরব--আমি অ ামার ছোট বোনকে জন্মের শোধ একবার দেখবার জন্য। জানি অনুমতি মিলবে। তুই গিয়ে জন্মের শোধ একবার আমার ক াছে গল্প শুনতে চাস্ ; ব্যস্।

দুনিয়াজাদী হয়ত বুঝল, হয়ত বা বুঝল না; তখনকার মতো চুপ করে রইল সে।

সন্ধ্যাকালে শাহরাজাদীকে বিয়ের কনে সাজিয়ে নিয়ে এলেন উজির বাদশার সামনে। দেখে চমকে উঠে বাদশা বললেন-- একি করেছ উজির, তুমি নিজের মেয়েকে...!

কি করব, জাহাঁপনা--দেশে আর মেয়ে তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া আমি না আনলে ও নিজেই আসত, ওর জিদ।

শাহরিয়ার একবার তাকিয়ে দেখলেন শাহরাজাদীর দিকে। যেন একটি সদ্যফোটা বসরাই গোলাপ, হীরেরঝলমলানি চে াখে মুখে তার। বললেন-তুমি নিজে এসেছ-ইচ্ছে করে-কাল সকালে তোমার কি দশা হবে তা জেনেও?

জী, জাহাঁপনা--জেনেও। একরাত্রি আপনার বেগম হবার এমন সৌভাগ্য লাভের জন্য শতবার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী অ াছি আমি।

উজিরের মেয়ের কথা শুনে বাদশা একেবারে থ। তাঁর মুখে থেকে আর কোনো কথা সরলো না।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল।

শাহরাজাদীকে খুব ভালো বাদশার। অনেক আদর পেলে বাদশার কাছ থেকে সে। সুযোগ বুঝে শাহরিয়ারকে বললে-- অনেক পেয়ার পেলাম জাহাঁপনা আপনার কাছ থেকে, জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে। তবে একটা আরজি আছে আপনার কাছে আমার, রাখবেন কি?

বলো বলো, আজ রাতে কিছু অদেয় নেই তোমায় আমার।
শাহ্‌রাজাদী বললে---জাহাঁপনা, আমার একটি ছোট বোন রয়েছে, নাম তার দুনিয়াজাদী।--তাকে খুব ভালবাসি আমি। কাল সকালে তো দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমাকে, তার আগে---যতক্ষণ আছি, মানে আজকে বাকি রাতটুকু আমি তাকে কাছে রাখতে চাই।
বাদশা তখনই লোক পাঠিয়ে শাহ্‌রাজদীর ছোট বোনকে নিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। এনে পাশের একটা পালঙ্কে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।
রাত্রি তিন প্রহর কেটে গেছে, আর একটি প্রহর মাত্র বাকী। দুই বোনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না, থাকবার কথাও নয়। দুনিয়াজাদী বলল, দিদি ঘুমোসনি?
কেন রে দুনিয়া?
ওদের কথা শুনে শাহরিয়ারেরও ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে রইলেন তিনি দুই বোনের কথাবার্তা শোনবার জন্য।
দুনিয়া বললে--দিদি, একটা গল্প শোনাবি? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই, আর তো শুনতে পাবে না, জন্মের শোধ তাই--
শাহ্‌রাজাদী জবার দিলে--জাহাঁপনা জাগুন আগে, তাঁর অনুমতি পেলে তবে শোনাতে পারি।
শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন; বললেন--আমি জেগেছি। বেশ তো, শোনাও না তোমার বোনকে গল্প---আমিও শুনি।
বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীরে মধুর কণ্ঠে শাহ্‌রাজাদী শু করলে তার গল্পঃ সে যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত । তাছাড়া যাদুকরীর মতো সে। কথার ইন্দ্রজাল বুনে চলল শাহরিয়ার আর দুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল কত ম প্রান্তর, খর্জুরবীথি, কত সরিৎসাগর, পর্বত, কত দৈত্য-দানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে জহরৎ, কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদ ঝঞ্ঝা, প্রমোদ-বিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটিল চত্রান্ত, হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী।
গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প কিন্তু শেষ হল না। শাহরিয়ার বললেন--বেশ, বাকিটুকু কাল আবার শুনবে া---
গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্য বেগমের গর্দান নেবার হুকুম দিতে পারলেন না বাদশা

তারাপত রাহার 'আরব্য রজনী' সাত পর্বে বিভাজিত। রামানন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আরব্য উপন্যাস' --এর তুলনায় তার াপদ রাহার গ্রন্থে কাহিনীসংখ্যা বেশি। রামানন্দর ঝোঁকটা ছিল শিশুতোষ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থরচনার, তারাপদ রাহার ঝোঁকটা ছিল অপেক্ষাকৃত বিশদ গ্রন্থরচনার। তবে দুজনেই কুৎসিত ভয়ংকর যৌনউৎসব ও যৌনবিকৃতি যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। তারাপদ রাহার শব্দব্যবহারে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা রামানন্দের তুলনায় বেশি।

আমরা এখানে রামানন্দর 'আরবী উপন্যাস' ও তারাপদ রাহার 'আরব্য রজনী'র পর্ব থেকে এমন কয়েকটি গল্প উদ্ধার করব, যার মূল বিষয় একই। পাশাপাশি এই উপস্থাপনায় দুজনের গল্পকথন, বিন্যাস ও শিল্পরূপের পার্থক্য অনুভব করা যেতে পারবে বলে আমার ঋাস।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ রাহার একই গল্প পাশাপাশি রেখে দেখা যেতে পারে।
যেমন, সিন্দবাদ নাবিকের গল্প।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আরব্য উপন্যাস'-এ লিখেছেন 'সিন্দবাদ নাবিকের কথা।'---

সিন্দবাদ নাবিকের কথা
হারুন-অল-রশীদ রাজার রাজত্ব-সময়ে বাগদাদ নগরে হিন্দবাদ নানে এক গরীব মুটে ছিল। একদিন গরমের সময় সে ম াথায় উপর একটা বড় মোট লইয়া নগরের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে রোদে ক্লান্ত হইয়া এক গলির মধ্যে ঢুকিল। সেখানে অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল এবং পথগুলি গোলাপজলে ভিজান থাকতে সমস্ত গলিতে এমন সুগন্ধ হইয়াছিল যে, মুটিয়া সেই সুন্দর জায়গা ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া মাথা হইতে মোট নামাইয়া বিশ্রাম করিবার

জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে গিয়া বসিল। ঐ বাড়ী হইতেও নানারকম সুগন্ধ বাহির হইয়া চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল। মুটিয়া সেই গন্ধ পাইয়া এবং বাড়ীর মধ্যে নানাজাতীর পাখী মিষ্ট গলায় একসঙ্গে যে গান করিতেছিল তাহা শুনিয়া খুবই খুসী হইল। কিন্তু এর আগে আর কখনো ঐ পথ দিয়া আসা-যাওয়া না করাতে, সে ঐ বাড়ী কাহার তাহা বুঝিতে না পা রিয়া দারোয়ানের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! এ বাড়ী কার?" সে উত্তর কলি, "সুপ্রসিদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের এই বাড়ী। তুমি বাগ্দাদ নগরে থাক, অথচ এটা জান না? " মুটিয়া পূর্ব্বে সিন্দবাদের ঐর্য্যের কথা কেবল কানে শুনিয়াছিল, সম্প্রতি নিজের চোখে তাহা দেখিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হে জগদীশ্বর! তুমি সিন্দবাদ ও হিন্দবাদের অবস্থার এমন প্রভেদ করে দিলে কেন? আমি সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করে নিজের আর বাড়ীর লোকের জন্যে যা-তা খাবারও জোগাড় করতে পারি না। কিন্তু সিন্দবাদ এত ধন পেয়ে পরম সুখে কাল কাট াচ্ছেন। সিন্দবাদ এমন কি কাজ করেছিলেন যে, তিনি এত বড়লোক হলেন? আর আমিই বা এমন কি করেছিলাম যে আম াকে এমন অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করতে হচ্ছে?"

মুটিয়া এই-সব বলিতেছে, এমন সময় একজন চাকর ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মুটিয়ার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,"তুমি শীঘ্র এস, প্রভু সিন্দবাদ তোমাকে ডাক্ছেন।" মুটিয়া এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিতে লা লিল,"নিশ্চয় আমি যে-সব কথা বলছিলাম, তা সিন্দবাদের কানে গিয়ে থাকবে,"কাজেই সে সিন্দবাদের কাছে উপস্থিত হইতে ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু ভৃত্য তাহাকে আশ্বাস দেওয়াতে সে তাহার সঙ্গে যাইতে সাহসী হইল। সে ঐ চাকরের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে ঢুকিল। সেখানে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের ঠিক মধ্যে একজন সুশ্রী চেহারার বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তাঁহার পিছনে চাকরবাকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ তাঁহার আজ্ঞা প ালন করিবার জন্য জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ বৃদ্ধেরই নাম সিন্দবাদ। মুটিয়া এই-সকলস মারোহ দেখিয়া আরও বেশী ভয় পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে প্রণাম করিল। সিন্দবাদ মুটিয়াকে বিশেষআদর করিয়া নিজের ডানদিকে বস াইয়া ভাল সরবৎ পান করিতে দিলেন। মুটিয়া আদর করিয়া তা লইয়া পান করিল।

তারপর সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে, সিন্দবাদ মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই। তোমার নাম কি, তুনি কি ক াজ কর?" সে উত্তর করিল, "মহাশয়! আমার নাম হিন্দবাদ। আমি মোট বয়ে কোনোরকমে দিন গুজ্রান করি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তোমার সহিত দেখা হওয়াতে আমরা খুব খুসী হয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষ ন আগে তুমি গলিতে বসে যে- সকল কথ া বলছিলে তা তোমার মুখে আর একবার শুনতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে।" হিন্দবাদ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "মহ াশয়! আমার শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল, সে অবস্থায় কি বলেছি তার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তুমি ভয় পেও না। আমি এমন অবিবেচক লোক নই যে, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব। তোমার মত দুরবস্থার লোকের পক্ষে এরকম কথা বলা স্বাভাবিক। আমি তোমার কষ্টের কথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। তুমি মনে করছ. আমি বিনা কষ্টে অনেক টাকা রোজগার করেছি, কিন্তু আসলে তা নয়, আমি অনেক কষ্ট করে তবে এমন সুখের অবস্থা পেয়েছি।"

এই কথা বলিয়া সিন্দবাদ সভার সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভদ্রগন! আমি টাকা রোজগার করবার জন্যে যে-সব আশর্চ্য্য কাজ করেছিলাম, তাতে অত্যন্ত লোভী লোকেরও মনে ভয় হয়। আমি সাত-বার বাণিজ্যযাত্রা করে যে-সমস্ত বিপদে পড়ি, সে-সকল আপনারা না শুনে থাকতে পারেন। অতএব আমি এই - সব কথা আগাগোড়া বলছি শুনুন।"

এরপর শু হল সিন্দবাদ নাবিকের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী। পর পর সাতটি গল্প-- সাতবার সিন্দবাদের বাণিজ্যযাত্রার অ্যা ডভেঞ্চার বর্ণিত হল। সিন্দবাদ কেবল নাবিক নয়, ব্যবসায়ী ও কুশলী কথক।

এর পাশে রাখা যেতে পারে তারাপদ রাহার 'আরব্য রজননী'তে সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী--

সিন্দবাদ বণিকের কাহিনী

বাদশা শাহরিয়ারকে তসলিম করে শাহরাজাদী আবার তার গল্প করলো---

হান আল রসিদ তখন বাগদাদের খলিফা। ঐ বাগদাদ শহরেই থাকত এক মুটে, গরিব মুটে, নাম ছিল তার হিন্দবাদ। হিন্দবাদ সকাল থেকে সন্ধে অবধি মোট বইত, একটু থামা নেই, আলিস্যি নেই। এমনি করে সারাদিন খেটে সে যে দু-পয়সা পেত তা দিয়েই তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করত। কারো সঙ্গে তার ঝগড়া বিবাদ নেই, রাগ রিষ নেই, নিজের খাটুনি আর দারিদ্র্যের জন্যে খোদার কাছে বুক চাপড়ে নালিশ করাও নেই।

একদিন দুপুরে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরের মাঝে মস্তবড় এক খেজুরের বোঝা পিঠে করে চলতে চলতে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘামে একেবারে নেমে উঠেছে। একটু না জিরিয়ে তো চলা যায় না। এমন সময় হঠাৎ সামনে পড়ল দেউড়িওয়ালা মস্ত বড় একটা বাড়ি, সামনে তার এক গাছ, গাছের নীচে চওড়া শানবাঁধানো জায়গাটা পরিস্কার করে জল ছিটিয়েও দেওয়া আছে।

আঃ খোদা, মালিক, মেহেরবান--বলে মুটে তার ভারী বোঝাটা শানের উপর রেখে নিজের তার এক পাশে বসল। তারপর মাথার ময়লা পাগড়িটা খুলে তাই দিয়ে গা মুছে, তাই দিয়েই নিজেকে বাতাস করতে লাগল।

বাঃ দিব্যি খোশবায় আসছে তো! আতর গোলাবের খোশবায় আর তার সঙ্গে কোর্মা, কাবাব, কালিয়া, পোলাওয়ের গন্ধ। শুধু তাই নয়--কানে ভেসে আসছে নাচ গান আর ফুর্তির আওয়াজ।

মুটের মেজাজটা হঠাৎ একেবারে খিঁচ্‌ড়ে গেল। কোনদিন যে নিজের ভাগ্যের জন্যে খোদার কাছে নালশ জানায়নি তার মুখ থেকে তখন ঝাঁঝালো গলায় বেরিয়ে গেল---হা খোদা, তোমার দুনিয়ায় এমন কেন হয়? সারাদিন বোঝা বয়ে আমার শিরদাঁড়া বেঁকে গেল, তবু দু-মুঠো অন্ন ছাড়া আমার নসিবে আর কিছু জোটে না। অথচ এই লোকটা --এই বাড়ির মালিক, যার কোনদিন বোঝা বইতে হ'ল না, কোন কষ্ট করতে হল না। সে কেমন তোফা আরামে আছে। নাচ গান, খাশবায়, জমকালো ভাল খানা--কোন কিছুর অভাব নেই তার। তোমার দেওয়া রোদ পানি হাওয়ার সমান ভাগ পায় সবাই, তবে নসিবের বেলায় তুমি এমন করে কেন, মালেক--

যে বাড়ির সামনে বসে মুটে এই খেদোক্তি করছিল তার মালিক শহরের এক নামকরা সদাগর, প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁর, নাম সিন্দবাদ। হিন্দবাদ নিজের নসিবের জন্য খোদার কাছে যে নালিশ জানালে--সিন্দবাদ দোতালায় ঘরে দাঁড়িয়ে তা শুনতে পেয়েছিলেন। শুনতে পেয়েই তিনি তাঁর এক বান্দাকে ডেকে বললেন--এরে, যা তো দৌড়ে। ঐ মুটেটাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।....

বাড়ির মালিক সিন্দবাদ মুটেকে প্রশ্ন করলেন-- তুমিই দেউড়ির সমনে খোদার কাছে নিজের নসিবের জন্যে নালিশ করছিলে।

..... তোমাকে আমি বসতে বললাম কেন জানো? ..... তোমার ধারণা তুমি বড় কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোনরকমে দিন গুজরান করছ, আর আমি কোনরকম কষ্ট না করে পরিশ্রম না করে দিব্যি রাজার হালে আছি। তোমার এ ধারণা ভূল, বন্ধু। এই সুখ সম্পদ লাভ করতে আমার যে কি দুঃখ - কষ্ট, পরিশ্রম করতে হয়েছে, কি ভয়ংকর বিপদ ঝঞ্ঝা পোয়াতে হয়েছে তা শুনলে তুমি বুঝবে--তোমার এ কষ্ট তার কাছে কিছুই না। আমার জীবনের সেইসব কাহিনীই তোমায় শোনাতে চাই, কি--শুনতে আপত্তি আছে তোমার?

হিন্দবাদ বিনীতভাবে মাথা দুলিয়ে জানালে---না।

তবে শোন---"

শু হল সিন্দবাদের গল্প। এখানেও সিন্দবাদ পর পর সাতবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শোনাল গরীব হিন্দবাদ মুটেকে। প্রতিদিনই হিন্দবাদকে ডাকে সিন্দবাদ, তাকে ভালো করে খাওয়ায়, তারপর একটি করে তার বাণিজ্যযাত্রা ও সমুদ্রযাত্রার

গল্প বলে। পর পর সাতদিনে সিন্দবাদ বণিক হিন্দবাদ মুটেকে গল্প শোনায়।

এভাবেই গড়ে ওঠে গল্পচত্র। আর সেই গল্পধারা রাতের পর রাত শাহারজাদী বলে চলে সুলতানকে। আরপ্রতি রাতভোর হলে সুলতান গল্পের নেশায় আপ্লুত থাকেন, শাহরাজাদী কোতল স্থগিত রাখেন, পরের রাত ফের গল্প শুনতেথাকেন। এভ াবে বহে চলে সময়ের স্রোত। এক হাজার এক রজনী সুলতান গল্প শোনেন। শেষ পর্যন্ত গল্পকথক শাহরাজাদী কোতল না করে তাকে নিয়েই সুখি ঘরকন্না করেন।

লক্ষ্য করার মতো, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সাধু ভাষায়, তারাপদ রাহার গল্প চলিত ভাষায়। স্বীকার্য, একদা রাম ানন্দ-রচিত 'আরব্য উপন্যাস' শিশুচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল, এখনো করে, তারাপদ রাহার 'আরব্য রজনী'ও শিশুচিত্তমুগ্ধ করে। আসলে, মানুষ গল্পপিপাসু। দেশ কাল বয়স ভেদে এই জীবনসত্যের কোনো হেরফের হয় না। গুহামানুষ একদা গল্প শুনত, আধুনিক মানুষও গল্প শোনে, শুনতে চায়, মুগ্ধ ও বিস্মিত হতে চায়।
আরো যে সব আরব্য রজনীর গল্প শুনে চারপাঁচ প্রজন্মে ধরে বাঙালি মানুষ হয়েছে তার মধ্যে আছে আলাদীনের গল্প, ব াবা আবদুল্লার গল্প, আলীবাবা ও চল্লিশ দস্যুর গল্প। আলাদীনের গল্প---রামানন্দ ও তারাপদ রচিত আলীবাবা ও আশ্চ র্য প্রদীপের কাথা---এখানে পরপর কিছুটা উদ্ধার করি। তা থেকে এই দুই লেখকের গল্প উপস্থাপন পদ্ধতি অনুবাধন করা যাবে।
প্রথমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরে আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের প্রথমাংশ।---

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা
চীনরাজ্যে কোনো রাজধানীতে মুস্তাফা নামে এক দর্জী বাস করিত। তাহার এক স্ত্রী ও একটি পুত্র ছিল। সে এমনি গরীব যে, দর্জীর কাছ করিয়া প্রতিদিন যাহা রোজগার করিত, তাহা দিয়া তাহার এই ছোট পরিবারেরও ভরণপোষণ হইয়া উঠিত না। দর্জীর ছেলের নাম আলাদিন। আলাদিন ছেলেবেলা বড় দুষ্ট এবং পিতামাতার অবাধ্য ছিল, সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল সমবয়স্ক দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পথে পথে খেলা করিয়া দিন কাটাইত। যখন কাজ শিখিবার সময় উপস্থিত হইল, দর্জী তখন তাহাকে কাজ শিখাইবার জন্য নিজে দোকানে লইয়া যাইত। কিন্তু মিষ্ট কথা কি বকুনি কিছুতেই সে সেদিকে মনোযোগ দিত না। পিতাকে একবার অন্যমনস্ক দেখিলেই সে সমস্ত দিনের জন্য কোথায় পলাইয়া যাইত এইজন্য মুস্তাফা তাহাকে স র্বাদা বকিত। কিন্তু কোনো-রকমেই তাহার সে কুস্বভাবে পরিবর্তন হইল না দেখিয়া দর্জী অত্যন্ত মনে াবেদনায় অল্পদিনের মধ্যে এমন পীড়িত হইয়া পড়িল, যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

দর্জী মারা যাইবার পর, আলাদিনের মা, ছেলেকে কাজকর্ম্মে অত্যন্ত অমনোযোগী দেখিয়া দোকানপাঠ তুলিয়া দিয়াদোক ানের কাপড় - চোপড় বেচিয়া ফেলিয়া একটি চর্কা কিনিল, আর তাই দিয়া সূতা কাটিয়া কোনো - প্রকারে আপনার ও ছেলেটির খাওয়া-পরা চালাইতে লাগিল। এদিকে আলাদিন পিতার শাসনের ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মাতার অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়াও তাঁহার কোনো কথা শুনিত না, এবং তাহার মা কাজকর্ম্মের কোনো কথা তুলিলেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

এক দিন আলাদিন এমনি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির কয়েকটি মন্দ ছেলের সঙ্গে রাজপথে খেলা করিতেছে, এমনসময়ে আ ফ্রিকাদেশের একজন বিখ্যাত মায়াবী আপনার কোনো কার্যসিদ্ধির মতলবে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সেআলাদিনকে দেখিবামাত্র ঐখানে দাঁড়াইল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন বুঝিল যে,তাহাকে দিয়াই স্বকার্য্য সাধন হইতে পারিবে, তখন সে প্রতিবেশী লোকদের কাছে তাহার পরিচয় জানিয়া আসিল।তারপর সে আলাদিনের কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও হে ছোকরা! তুমি কি মুস্তাফা দর্জীর ছেলে?" আলাদিন উত্তর করিল, "তা মহ াশয়, আমি তাঁরই ছেলে বটে, কিন্তু অনেক দিন হল, তিনি মারা গেছেন।"

এই-কথা শুনিবামাত্র, মায়াবী আলাদিনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। আলাদিন তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল"বাছা! আমি তোমার কাকা, তোমার বাবা আমার বড় ভাই ছিলেন। আমি অনেকদিন দেশ ভ্রমণের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আশায় দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু তোমার মুখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে যে কি পর্য্যন্ত শোক পেলাম, তা আর কি বলব।" মায়াবী এই কপট শোক প্রকাশ করিয়া আলাদিনকে আবার জিজ্ঞাসা করিল,"তোমার মা এখন কোথায়?"
আলাদিন নিজেদের বাড়ীর পরিচয় দিল। তাই শুনিয়া মায়াবী আলাদীনের হাতে কয়েকটি মোহর দিয়া বলিল, "বৎস! এই কয়েকটা টাকা তোমার মার হাতে দিয়ে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। যদি আমি অবকাশ পাই, তা হলে কাল এসে তঁার সঙ্গে দেখা করব।" এই বলিয়া মায়াবী সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আলাদিন টাকা পাইয়া খুসী হইয়া বাড়ী গিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার কি কোন খুড়া আছে ?" তাহার জননী বলিল, "না বাছা, তোমার কাকা, কি মামা কেউ নেই।" ইহা শুনিয়া আলাদিন বলিল, "অল্পক্ষণ হল, একটি লোক এসে আমাকে বল্লেন, আমি তোমার কাকা, আর আমার বাবা স্বর্গে গিয়েছেন শুনে তিনি কতই কাঁদতে লাগলেন। তার পর আমার মুখে চুমু দিয়ে আমার হাতে এই কয়েকটি টাকা দিয়ে কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে চলে গেলেন।" আলাদিন এই-কথা বলিয়া মাতার হস্তে টাকাগুলি দিল। তাহার মা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াবলিলেন, "হাঁ বাছা! তোমার একজন খুড়া ছিল বটে, কিন্তু অনেক দিন হল তার মৃত্যু হয়েছে।" তার পর তাহারা সেদিন এ-কথার কোনো উল্লেখ করিল না।

পরদিন জাদুকর আলাদিনকে শহরের আর-এক পাড়ায় সেই-রকম খেলা করিতে দেখিয়া তাহাকে আগের মত আলিঙ্গন করিয়া তাহার হাতে দুইটি মোহর দিয়া বলিল "বাছা! তুমি এই দুইটি টাকা তোমার মাকে দিয়ে বলো, তিনি যে আমাদের খাওয়ার জন্যে সামান্য কিছু আয়োজন করে রাখেন, আমি রাত্রে তোমাদের বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এখন আমাকে তোমাদের বাড়ীটা দেখিয়ে রাখো।" আলাদিন মায়াবীকে নিজেদের বাড়ী দেখাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মাতার কাছে গিয়া তাঁহার হাতে সেই দুইটি মোহর দিয়া খুড়ার ইচ্ছা জানাইল। আলাদিনের জননী টাকা পাইয়া তখনি সমস্ত খাবার তৈরী করিয়া, বাড়ীতে নিজেদের যে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহা প্রতিবাসীদের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনিল, এবং সন্ধ্যার পর বলিল, "আলাদিন! বোধ হয় তোমার খুড়া আমাদের বাড়ীর খোঁজ করতে পারেননি। যাও তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

এভাবেই গল্পের স্রোত প্রবাহিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় আশর্চ্য প্রদীপের কাহিনী প্রদীপটা একটু ঘষলেই ধোঁয়াওঠে আর ধোঁয়া আকার নেয় দেখা দেয় এক দৈত্য। সেই দৈত্য আশর্চ্য প্রদীপের মালিকের আজ্ঞাহীন, ইচ্ছা প্রকাশমাত্র সেই ইচ্ছা পূরণ করে। এই কাহিনী পাঠককে টেনে নিয়ে যায় এক অদ্ভুত জগতে, যেখানে সবই সম্ভব। আলাদীনের অনেক আশর্চ্য কাহিনী এই গল্পের অন্তর্ভুক্ত।
তারাপদ রাহার 'আরব্য রজনী'তেও পাই আলাদীনের গল্প। গল্পটির নাম--- 'আলাদীন'। তার সূচনাংশে উদ্ধার করি।
আলাদীন
বোন দুনিয়াজাদীর অনুরোধে বাদশা শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী গল্প শু করলে---
চীনামুলকের এক শহর, নাম আলকাল। সেই শহরে থাকে এক দরজী, নাম তার মুস্তাফা। মুস্তাফা অতি গরিব। সংসারে অবশ্য তিটি মাত্র প্রাণী, বছর দশেকের একটি ছেলে, বউ আর সে নিজে। কিন্তু এই তিনটি প্রানীর খরচ যোগাতেই সে হিমসিম খেয়ে যায়। সংসার অতি কষ্টেই চলে। এত কষ্টই থাকত না, ছেলেটা যদি মানুষ হতো, একটু কাজকর্ম করে বাপের সাহায্য করত! কিন্তু সে ধাঁচের ছেলেই নয় আলাদীন। কাজ করতে তার বয়ে গেছে, কাজ শিখতে বললে তার জ্বর আসে, সে অমনি কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তারপর আর কি-খেলা আর খেলা --শুধু খেলা। তবু সঙ্গীগুলো যদি ভ

ালো হতো, --তার খেলার সঙ্গীগুলোও হচ্ছে তার মতো ঘর-পালানো সব লক্ষ্মীছাড়া দল।
বাপ মাঝে মাঝে তবু ডাকে--শোন, আমার কথা শোন, আমি বেঁচে থাকতে কাজকর্ম কিছু শিখে নে আমার কাছ থেকে, নইলে মরে গেলে খাবি কি ?
ছেলে বলে--তুমি মরো তো আগে, তারপরে সে দেখা যাবে, --বলেই সে চোখের পলক পড়তে না পড়তে
ছুটে পালিয়ে যায়। মুস্তাফা ফ্যাল্ ফ্যাল করে পথের দিকে চেয়ে থাকে।
ক্রমে আলাদীনের বয়স পনের-ষোল হল, বাপ মারা গেল, মা বেচারী তখন অকূল পাথারে পড়ল। কাজকর্ম মিটে গেলে মা আলাদীনকে ডেকে বললে--ওরে, আর তো কোনো উপায় দেখছিনে। এবার দোকানে গিয়ে বোস্। খদ্দেরটদ্দের যা আছে তাদের রাখতে পারলে...
কে কার কথা শোনে! আলাদীন মুখ ঝাঁকুনী দিয়ে বললে---ও-সব আমার দ্বারা হবে টবে না, আমার সময় নেই--বলে ধিন্ ধিন্ করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

মা বেচারী তখন কি করে---দুটি পেটের দানা জোটাতে হবে তো ! ধরল সে তখন এ- বাড়ির বাসন মাজা, ও-বাড়িতেরান্না, তা ছাড়া অবসর সময়ে চরকায় সুতো কাটার কাজ। আর ছেলে তখনও সঙ্গীদের নিয়েসেই আগের মতো হেসে খেলে নেচে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে আসে সে শুধু খাওয়ার সময়, খাওয়া হলেই অমনি দে ছুট। একবার ভুলেও ভাবে না--মা কি করে সংসার চালাচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়।
রাস্তার মোড়ে একটা খোলা জায়গায় একদিন তার সঙ্গীদের নিয়ে কানামাছি খেলছে আলাদীন---এমন সময় এক বিদেশী যাচ্ছিল সে-পথ দিয়ে। হঠাৎ আলাদীনের দিকে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল ঃ আরে---দিব্যি চটপটে বেপরোয়া তো ছেলেটা---ভয়ডর বলে কিছু নেই, মুডুলি করতে ওস্তাদ! দেশে-দেশে এই রকম একটি ছেলেকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি এতকাল।

বিদেশী মরক্কোর মস্তবড় যাদুকর। তা ছাড়া পাকা গণৎকার। বিদেশী একটু আড়ালে থেকে একদৃষ্টে আলাদীনের হাবভাব, রকম-সকম কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলে। এক ফাঁকে একটা ছেলেকে কাছে পেয়ে মিষ্টি কথা বলে তার কাছে ওর নামধাম পরিচয় যা কিছু জানা দরকার তা সব জেনে নিলে, তারপর রইল সুযোগের অপেক্ষায়।
এক বাজি খেলায় জিতে আলাদীন বিদেশীর প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে বিদেশী তাকে ডাকল--এই খোকা, শোনো--
অজানা লোককে এমন ডাকতে দেখে আলাদীন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, কেন--কি চাই তোমার ?
তুমি মুস্তাফা দরজীর ছেলে না ?
হ্যাঁ, তা কী হয়েছে ?
বিদেশী তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা দুলিয়ে বলে উঠল--হ্যাঁ হতেই হবে, মুস্তাফাও যে এই বয়সে দেখতে ঠিক এমনিই চটপটে..তা তোমার বাবা ভালো আছে ?---মা ?
আমার বাবা--আজ দু'তিন বছর হল মারা গেছে।
অ্যাঁ, মারা গেছে! ---বলেই বিদেশী ফোঁস-ফোঁস করে কেঁদে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে কি সে নাকঝাড়া! কেঁদে কেঁদে বিদেশী বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল--সবই নসিব, রে আল্লা, সবই নসিব ! দাদা মুস্তাফাকে দেখব বলে বিদেশ থেকে এত পথ হেঁটে আমি চীনে এলাম, নিজের বাড়িতে---আর এসেই শুনি কিনা, দাদা--হায়, হায়, হায়---

বিদেশীকে এমনি করে কাঁদতে দেখে আলাদীন প্রথমে ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পরে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, বিদেশী তা বুঝতে পারে বলতে লাগল---আমাকে তুই দেখিসনি, রে বেটা, দেখিসনি, তাই চিনিস না, আমি তোর চাচা, মুস্তাফার সহোদর ভাই। এখন থেকে অনেক আগে---প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি বিদেশে ব্যবসা করতে যাই---ওঃ সে

কি আজকের কথা --দাদার তখনও বিয়েই হয়নি--আর দাদা আমার কি ভালই বাসত ! সেই দাদাকে ফেলে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ী থেকে, আর তারই শাস্তি দিতে দাদা আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল খোদার কাছ। ও হো হো হো, এ আমি কেমন করে সহ্য করব-- বলে বিদেশী আবার ফুঁপিয়ে কান্না শু করে দিল।"

ধাপে ধাপে শ্রোতার ঔৎসুক্য বাড়তে তাকে, কারপর কী হল, তারপর কী হল--এই প্রশ্ন শ্রোতাকে ধাক্কা দেয়, যেমন ধাক্কা দিয়েছিল সুলতানকে।

বাঙালির আরব্য রজনীর আর দুটি প্রিয় গল্প--বাবা 'আবদুল্লার বিবরণ' এবং 'আলিবাবা এবং ত্রীতদাসী কর্তৃক চল্লিশজন দস্যু বিনাশের বিবরণ।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'আরব্য উপন্যাস' থেকে এই দুটি গল্পের সূচনাংশ পরপর উদ্ধার করি।

প্রথমে 'বাবা আবদুল্লার বিবরণ' ঃ

বাবা আবদুল্লার আত্মবিবরণ

বাবা আবদুল্লা "মহারাজা! আমি বাগ্দদনগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামাতা পরলোকে যাইবার সময় আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যান। যৌবন অবস্থায় হাতে টাকা হইলে, সচারচর লোকে যে-রকম অপব্যয় করিয়া থাকে, আমি না করিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ক্রমশঃ ঐ ধন বাড়াইয়া তাহা দিয়া আশীটি উট কিনিলাম, এবং বণিক্দের ঐ উট দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া কিছুকাল কাটিবার পর, একদিন ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যদ্রব্যাদি ব ালশোর নগরে পৌঁওছাইয়া দিয়া নিজের উটগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে এক ঘেসোমাঠে ঐ উটগুলিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া এক গাছতলায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবারজন্য আমার পাশে আসিয়া বসিল। পরস্পর আলাপ -পরিচয়াদি করিবার পর দুজনে নিজের নিজের খাবার বাহির করিয়া একত্রে খাইলাম। তাহার পর নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে সন্ন্যাসী বলিল,"ভাই! এইখান থেকেঅল্প দূরে এক জায়গায় এত অর্থ আছে যে, তোমার আশিটা উট দিয়ে কেবল সোণা আর বহুমূল্য রত্নাদি বোঝাই করে আনলেও, তার কিছুমাত্র কমেছে মনে হবে না।" এই সংবাদ শুনিয়া আমি যেমন বিস্মিত হইলাম, ধনলোভে মুগ্ধহইয়া তেমনি মহানন্দ বোধ করিলাম এবং সন্ন্যাসীর কথার অবিশ্বাস না করিয়া বলিলাম, "হে যোগিবর, তোমরা তপার্থিব এই অর্থকে অতি সামান্য মনে করে থাকো। অতএব যদি আমাকে ঐ জায়গা বলিয়া দাও, তা হলে আমার সমস্ত উটরত্নে বোঝাই করে আনি এবং কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য তোমাকে তার ভিতর থেকে এক উট দিই।"মোট কথা তখন আমার মনের মধ্যে ধনলোভ এমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ঊনআশি উট ধন পাইয়াও যে এক উট-অর্থ তাহাকে দিতে হইবে, সেজন্য আমার বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সন্ন্যাসী আমার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরত্ত হইয়া কেবল এইমাত্র বলিল,"ভাই! আমি তোমাকে এত অর্থ দেখিয়ে দেবো, আর তুমি আমাকে কেবল একটি উট-ধন দেবে, এটা কি সঙ্গত? আমি এ কথা কারও কাছে ব্যত্ত না করে সমস্ত ধন নিজেই নিতে পারতাম। কিন্তু তোমার উপকার করবার জন্যে আমার সম্পূর্ণ ইচছা আছে, তাই তোমাকে ধনের জায়গা দেখাতে রাজি আছি। এখন আমি যা বলি শোন। তোমার আশিটা উট আছে, চল দুজনে গিয়ে সমস্ত উট বোঝাই করি, ত ার পর এদের মধ্যে থেকে চল্লিশটা আমাকে দিও আর বাকি চল্লিশটা তোমার থাকবে, তা হলে কখনো অন্যায় হবে না। ক ারণ তোমাকে যে চল্লিশটা উট দিতে হচ্ছে তেমনি তার বদলে তুমি যে অর্থ লাভ করবে, তা দিয়ে হাজার হাজার উট কিনতে পারবে।"

এরপর আলিবাবার গল্প। এই গল্প বাংলা নাট্যরূপে একদা কলকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, দর্শকপ্রিয় হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকটির দর্শকপ্রিয়তা আমাদের নাট্যপিপাসুরা ধারণা করতে প ারবেন না। স্বীকার্য, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনীতে কেবল প্রচুর পরিমাণে গল্পরস আছে, তা নয়, সেইসঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণে নাট্যরস।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে সেই কাহিনীর যে গল্পরূপ তার সূচনাংশ এখানে উদ্ধার করি।---

আলীবারা এবং এক ত্রীতদাসী কর্ত্তৃক চল্লিশজন দস্যু বিনাশের বিবরণ

প্যারস্য দেশের এক শহরে দুই ভাই বাস করিতেন। বড়র নাম কাশিম আর ছোটর নাম আলীবাবা। তাঁহাদের পিতা পরলোকে যাইবার সময় যে কিঞ্চিৎ বিষয় রাখিয়া যান, তাহা তাঁহারা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়েন। তাহার পর কাশিম যে মেয়েকে বিবাহ করিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একটি মস্ত বড় ভূসম্পত্তি এবং বহুমূল্য জিনিস পরিপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট দোকান ও একটি প্রকাণ্ড গোলাবাড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া শহরে একজন ধনবান্ বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আলিবাবাও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ভাইয়ের মত সৌভাগ্যবান হইতে পারেন নাই। তিনি একটি সামান্য বাড়ীতে বাস করিতেন, এবং প্রতিদিন কাছেরই এক জঙ্গলে গিয়া নিজের হাতে কাঠ কাটিয়া তিনটি গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া শহরে আনিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহা দিয়া অতি কষ্টে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিতেন।

এক দিন আলীবাবা বনে গিয়া কাট কাটিয়া পিঠে বোঝাই করিতেছেন, এমন সময়ে সামনে দিয়া অনবরত ধূলি উড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করাতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একদল ঘোড়সওয়ার খুবজোর সেই দিকে আসিতেছে। আলীবাবা ঐ ঘোড়সওয়রদের দস্যু মনে করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায়, তিনটি গাধার যেকি হইবে সে - বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া অবিলম্বে এক ঘন ডালপালায় ঘেরা গাছের ডালে লুকাইয়া থাকিলেন। গাছটি মস্ত বড় এবং একটা উচচ পাহাড়ের উপরে জন্মিয়াছিল বলিয়া কেহই সহজে তাহাতে উঠিতে পারে না। আলীবাবা ঐ গাছের উপর থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

অস্ত্রধারী লোকগুলি পাহাড়ের তলায় আসিয়া একে একে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতে লাগিল। আলিবাবা গণিয়া দেখিলেন, তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ চল্লিশজন, এবং তাহাদের সাজ সজ্জা দেখিয়া পরিস্কার বোধ হইল যে, তাহারা দস্যু না হইয়া যার না। দস্যুরা প্রতিবেশীদের উপর কোনো অত্যাচার না করিয়া দূরের লোকের ধনসম্পত্তি লুট করিয়া ঐখানেজমা করিতে আসিত। আপন আপন ঘোড়া গাছতলায় বাঁধিয়া প্রত্যেকেই সোনা ও রূপায় পরিপূর্ণ এক একটি থলি কাঁধে করিয়া লইল! তাহাদের মধ্যে এক জন প্রধান ছিল।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এখনো আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনী আমার ভালো লাগে। 'ওপেন সিসেম'--'সিমেস খোল্'--বলার সাথে সাথেই অরণ্যমধ্যে গুহার দরজা খুলে যায়, আলিবাবার সঙ্গেই পাঠক সেই অপরিমিত ধনরত্নের সামনে এসে পড়ে এই গল্পের একটি 'নীতিকথা' নিহিত আছে। এত রত্ন মণিমাণিক্য যদি আমাদের মাথা ঘুরিয়েদেয়, তবে গুহা-দরজা খোলার মন্ত্র আমরা ভুলে যেতে পারি। জীবনে হঠাৎই অনেক সুখের দরজা খুলে যায়, কিন্তু সেই হঠাৎ-পাওয়া সুখ --অপরিমিত ধনরত্ন ধরে রাখার মতো মানসিকতা অনেকেরই থাকে না। তখনি মারা পড়তে হয়। আলিবাবার মাথা ঘুরে যায় নি, তাই সেই রক্ষা পেয়েছে। আলিবাবার ভাইয়ের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই যে রক্ষা পায়নি।

বস্তুত আরব্য রজনীর কাহিনী আমাদের সমানে খুলে দেয় এক গল্পলোক, যা থেকে আমরা আহরণ করি অপার আনন্দ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com